গল্প

সাতটি তারার ওই তিমির

আহমেদ সাবের

তেরেশার ইমেইল খুলে মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না। সে লিখেছে, শুভ এখন উপর থেকে আমাদের দেখছে। আমার আকাশের দিকে তাকানো এখন আরও অধিক অর্থবহ। আমি শুভ কে সত্যি মিস করি। তবু সে যে আমাদের সাথেই আছে, ভাবতেই ভাল লাগছে। কি সুন্দর আইডিয়া।

তেরেশা ওর চিঠির সাথে রত্নার একটা চিঠি জুড়ে দিয়েছে। রত্না লিখেছে, শুভর নামে একটা তারার নামকরণ করা হয়েছে। তারার অবস্থান মেইলের সাথে জুড়ে দেয়া হল। সে চলে গেলেও, সান্ত্বনা এই যে, সে উপর থেকে সব সময় আমাদের উপর চোখ রাখছে।

ফিলিপাইনের মেয়ে তেরেশা সিডনী ইউনি'তে আমার সহপাঠী ছিল। এখন সপরিবারে থাকে ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে। শুভাশীষ পট্টনায়ক ছিল আমাদের আরেক সহপাঠী, যাকে আমরা শুভ বলে ডাকতাম। সে ছিল উড়িশ্যার ছেলে। একটু আধটু বাংলা বলতে পারতো বলে আমার সাথে ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সে অষ্ট্রেলিয়া ছেড়ে ওয়াশিংটন ডি সি তে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কম্পিউটার বিভাগে চাকুরী নিয়ে চলে যায়। তার স্ত্রী রত্নাকর্ন থাইল্যান্ডের মেয়ে, যাকে আমরা রত্না বলে ডাকি।

আমরা সিডনী ইউনি'র সহপাঠীরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লেও, টেলিফোন আর কম্পিউটারের কল্যানে আমাদের যোগাযোগটা থেকেই যায়। গত জুলাই মাসে শুভ ফোন করে জানাল, নভেম্বরে একটা সেমিনারে যোগ দিতে সে সিডনী আসছে। দীর্ঘ এগার বছর পর আমাদের আবার দেখা হবার আনন্দের আভাষ ওর কণ্ঠে পরিষ্কার পাওয়া যাচ্ছিল। নভেম্বরে আমার বাংলাদেশ যাবার কথা থাকলেও শুভ আসবে বলে যাওয়াটা স্থগিত রাখি।

কিন্তু শুভর আশা আর পূর্ণ হল না। অক্টোবরের এক কালো রাতে সুদুর আমেরিকা থেকে তেরেশার ফোন জানান দিল, আমাদের শুভ আর নেই। ইহকালের মায়া ছেড়ে সে পাড়ি জমিয়েছে অজানা গন্তব্যে। নভেম্বর এসে গেল কালের অমোঘ নিয়মে। শুভ আসবে বলে আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে রেখেছিলাম। ছুটিটা কাটলো বাসায় বসে বসে শুভর মৃত্যুজনিত বিষাদের কালো মেঘের আস্তরনে। তারপর কেটে গেছে একটা বছর। আমাদের সহপাঠীদের বা রত্নার ই-মেইল এবং টেলিফোন আলাপচারিতায় শুভ এসে যায় নিজেদের অগোচরেই।

রত্নার মেইলটা আবার পড়লাম। বুঝা গেল, আমাদের প্রিয় বন্ধু শুভর নামে আকাশে একটা তারার নামকরণ করা হয়েছে। মানুষের সাথে তারার সম্পর্ক সেই আদিকাল থেকে। তারায় আমরা প্রিয় জনের মুখ দেখি। তারার কাছে অনুরাগ বিরাগের কথা বলি। আকাশের তারার দিকে চেয়ে স্মরণ করি প্রিয়জনদের। কল্পকথার মৃতরা ঠাঁই করে নেন আকাশের বুকে – তারা হয়ে। এতো তারার দিকে চেয়ে শুভকে স্মরণ নয়; রীতিমত তারার নামকরণ করা হয়েছে ওর নামে।

জানতাম, শুভ বিশ্ব ব্যাঙ্কের বেশ বড়সড় কর্মকর্তা ছিল। ওর মৃত্যুর পর ওর সহকারীরা আমাদের সহযোগিতায় ওর নামে একটা ফাউন্ডেশন স্থাপন করেছে। কিন্তু ওর নামে তারার নামকরণ – ব্যাপারটা চাট্টিখানা কথা নয়!

রত্নার মেইলটার সাথে যে সংযুক্তিটা ছিল, ভুলে সেটা আমাদেরকে পাঠায় নি তেরেশা। ওটা থাকলে জানা যেত, কোথায় শুভর নামে নামাঙ্কিত তারাটার অবস্থান, কোন প্রতিষ্ঠান দিল নামটা। তেরেশাকে অনুরোধ করলাম,সংযুক্তিটা পাঠাবার জন্য। উত্তর এলো সাথে সাথেই। জে-পেগ ফাইলে শুভর নামে নামাঙ্কিত তারকার সনদপত্রের ছবি।

সনদপত্রটা কয়েকবার পড়লাম। একেবারে আন্তর্জাতিক তারকা পরিষদ – ইন্টারন্যাশনাল ষ্টার কাউন্সিল (আই,এস,সি) এর সীলমোহরাঙ্কিত সনদপত্র। দেখে গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠলো। ক্লাসিক্যাল ইংরেজীতে লেখা সনদে শুভর নামে নামাঙ্কিত তারকার অবস্থান দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, শুভর নামকরনের সনদ স্থায়ীভাবে সুইজারল্যান্ডের বিশেষ ভল্টে রাখা হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে কপিরাইট করা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হবে।

আমার জানা মতে, আকাশের লক্ষ লক্ষ তারার মাঝে কেবল সামান্য কিছু তারার নামকরণ করা হয়েছে। কি সৌভাগ্য, আমাদের শুভর নাম তাদের মাঝে ঠাঁই করে নিলো। আগে জানতাম, সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কের ভল্টে মানুষের টাকা আর মহা মূল্যবান সম্পদ গচ্ছিত থাকে। আন্তর্জাতিক তারকা পরিষদ (আই,এস,সি) এর সনদ অবশ্যই মহা মূল্যবান সম্পদ; তাই হয়তো বিশেষ ভল্টে রাখার ব্যবস্থা।

শুভর নামে নাম করা তারাটার অবস্থান হল – উরশা মেজর আর,এ ১৭ এইচ ৫৯ এম ডি ৬৫’৭”। তারকামন্ডল সম্পর্কে আমার জ্ঞান শূন্যের কাছাকাছি। ইন্টারনেটের বদৌলতে জানলাম, উরশা মেজর এর মানে হল, বিশাল ভাল্লুক। আমাদের অতি পরিচিত সপ্তর্ষি মণ্ডল, উরশা মেজর তারকাপুঞ্জের অংশ। বুঝলাম,উরশা মেজর মানে কি। কিন্তু সেখানেই আটকে গেলাম।

উরশা মেজর হয়তো আকাশে খুঁজে বের করতে পারবো; কিন্তু তার পরের সাঙ্কেতিক অক্ষর গুলোর মানে কি? আমার এক সহকর্মী, রজারের জ্যোতির্বিজ্ঞানে কিছুটা আগ্রহ আছে। ওকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সাঙ্কেতিক অক্ষর গুলোর মানে হল, উরশা মেজর তারকা পুঞ্জের হাজার হাজার দৃশ্য-অদৃশ্য তারকার মাঝে শুভর নামে নামাঙ্কিত তারাটার হিসাব ভিত্তিক অবস্থান। রজার আরও বললো, তবে,দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উরশা মেজর দেখা যায় না। সুতরাং দেখার চেষ্টা করে লাভ নেই।

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কয়েক দিন কেটে গেল। একদিন সকাল বেলা অফিসে আসতেই রজার ছুটে এলো আমার ডেস্কে।

তুমি না বলেছিলে, তোমার কোন বন্ধুর নামে একটা তারার নাম দেয়া হয়েছ?

হ্যাঁ, বলেছিলাম তো। আমার উত্তর।

কারা নাম দিয়েছে? রজারের প্রশ্ন।

কে আর দেবে? আন্তর্জাতিক তারকা পরিষদ দিয়েছে।

আমি তাই আশঙ্কা করছিলাম। রজার মাথা চুলকে বলল।

মানে? আমার অবাক হবার পালা।

আই,এস,সি নামে কানাডার একটা ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তথাকথিত তারকা নামকরণের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বহুদিন ধরে। কাল সারারাত ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে আমি ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। আকাশের তারা হল বিশ্বের সকলের সম্পদ। আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা ছাড়া, কোন তারার নামকরণের আইনগত অধিকার সারা পৃথিবীতে আর কারো নেই। মন্তব্য করে রজার।

তা হলে আই,এস,সি তারকা নামকরণের সনদপত্র দিল কি করে? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

এ হল মালিক না হয়ে অন্য কারুর জিনিষ বিক্রি করার মত ঘটনা। তুমি যদি সারা আকাশটাই কারু কাছে বিক্রি করে একটা সনদপত্র দিয়ে দাও, তোমাকে ঠেকাবে কে? তবে যে কিনল,সে আকাশটা পাবে কি পাবে না,সেটা ওর ব্যাপার।

বল কি! এতো রীতিমত জালিয়তি। ওরা যদি অন্যায় করে লোক ঠকাচ্ছে, আমেরিকা বা কানাডা সরকার ওদের ধরছে না কেন?

সেখানেই তো ফাইন প্রিন্টের কেরামতি। ওদের সাইটে গিয়ে দেখো, ওরা পরিষ্কার ভাবেই বলেছে, ওরা যে তারার নামকরণ করে, সেগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। ওরা তোমার নামে যদি কোন তারার নামকরণ করে, তুমি তারাটার মালিক হয়ে যাবে না। ওদের ছাপানো একটা বইতে শুধু তোমার নামটা উঠবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব জেনেও মানুষ ওদের কাছ থেকে তারা কিনছে কেন?

ভুল বললে। তারা কিনছে না; ওদের বইতে অদেখা তারার নামে নিজেদের নাম লেখাচ্ছে। তোমার প্রশ্ন – মানুষ তা করছে কেন? আবেগ, আবেগ। মানুষের আবেগকে পুঁজি করে ব্যবসা করছে তারা বেচার কোম্পানি গুলো। সারা আমেরিকার, বিশেষ করে গ্রাম্য এলাকার রেডিও ষ্টেশন গুলোতে তারা রাতদিন প্রচারণা চালাচ্ছে, প্রিয়জনের নামে তারার নামকরণ করুন; আপনার ভালবাসাকে অমরত্ব দিন। কিছু ডলারের বিনিময়ে ভালবাসাকে অমরত্ব দিতে কে না চায়?

সেদিন রাতের বেলা আমি নিজেই ইন্টারনেট ঘাটতে বসে গেলাম। দেখলাম, শুধু আই,এস,সি নয়, এ ধরনের আরও সাত আটটা কোম্পানী তারা বেচার ব্যবসায় নিয়োজিত। আই,এস,সি গর্ব করে বলেছে, উনিশ শ ঊনআশি সালে স্থাপিত হবার পর থেকে, গত একত্রিশ বছরে তারা এক মিলিয়নের উপর তারকা কারো না কারো নামে নামকরণ করেছে। নামের লিস্টে অন্দ্রে আগাসি, জন বোল্টন, বিল ক্লিন্টন, ক্যাথি ফ্রি-ম্যান সহ অনেক দামী নামী ব্যাক্তির স্থান আছে। ওদের বিজ্ঞাপনে লিখেছে – “Put their name in the sky and give them a piece of immortality”। মহাশূন্যে তাদের নাম লিখে তাদের নামকে অমরত্ব দিন। কি মধুর আশ্বাস।

বিশ্বের নানা দেশে আই,এস,সি’র প্রতিনিধি রয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে সিডনীর কুজি বীচের একটা পোষ্টঅফিস বক্সের ঠিকানা,একটা টেলিফোন নাম্বার,ফ্যাক্স নাম্বার আর একটা ই-মেইলের ঠিকানা দেয়া আছে। মূল্য তালিকায়,বেসিক,ডিলাক্স আর আল্টিমেট তারকা নামকরণের প্যাকেজের দাম যথাক্রমে দুইশত পঞ্চাশ,তিনশত পঞ্চাশ এবং চারশত পঞ্চাশ ডলার মাত্র।

আই,এস,সি’র বিরুদ্ধে অনেক মামলা হয়েছে। তবে তারা কথার মার প্যাচে প্রতিবারই সঙ্কট কেটে উঠেছে। ইন্টারনেটের বিভিন্ন ব্লগে তাদের এই প্রতারণামূলক ব্যবসা সম্পর্কে অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু হৃদয়ের কাছে মস্তিষ্ক চিরদিনই হার মেনেছে। মাঝখানে কিছু প্রতারকের ব্যাঙ্ক একাউন্ট ফুলে ফুঁসে উঠেছে মাত্র।

আই,এস,সি আর তার সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান গুলোর কীর্তি কাহিনী পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গেল। ঘুম আর আসলো না। ভাবলাম,রত্নাকে ফোন করি। ওর কাছে প্রতারকদের ভণ্ডামির মুখোসটা উন্মোচন করে দেই। উঠে ঘড়ি দেখলাম – রাত তিনটা বাজে। ওয়াশিংটন ডি সি তে এখন দুপুর। রত্নাকে কি এখন বাসায় পাওয়া যাবে? অবশ্য শুভ মারা যাবার পর থেকে সে বেশীর ভাগ সময় বাসায় থাকে; বাসা থেকে কাজ করে। আমি ওর নাম্বার ডায়াল করলাম। রিং হচ্ছে; রত্না হ্যালো বলল। আমি ওর গলা শুনলাম এবং ধীরে ধীরে ফোনটা রেখে দিলাম।

কি করে ওর হৃদয়ের গভীরে গড়া বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দেই? হোক না মেকী; হোক না শুভর নামে তারার নামকরণের সনদটা এক খণ্ড কাগজ মাত্র। কিন্তু ওর কাছে তো সেটাই সত্য,সেটাই হীরার চেয়ে দামী। বিশ্বাসের বর্মে পরিবেষ্টিত হয়ে,ওর ভালবাসা বেঁচে থাকুক অনন্তকাল ধরে।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। নির্মেঘ রাতের আকাশে তারার মেলা। ছোট বেলার কথা মনে পড়লো। সপ্তর্ষি মণ্ডলকে আমরা চিনতাম লাঙ্গল বলে। রাতের আকাশে কতদিন খুঁজে বের করেছি সপ্তর্ষি মণ্ডলকে। রজার বলেছে,দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উরশা মেজর দেখা যায় না। তবু আমি পাগলের মতো উত্তর গোলার্ধের দিকে চেয়ে সপ্তর্ষি মণ্ডলকে খুঁজতে লাগলাম,যার গণ্ডীতে হাজার হাজার দৃশ্য অদৃশ্য তারার মাঝে একটা তারার নাম শুভ।

ওই তো,দেখা যাচ্ছে। ওই যে বিশাল ভাল্লুক। তার মাঝ খান থেকে সাত টা ফিকে রঙের তারা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হতে হতে একটা লাঙ্গল হয়ে গেলো। লাঙ্গলের জমিন থেকে একটা তারা হঠাৎ করে হেসে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল সাতটা তারার ওই তিমিরের গভীর শূন্যতায়। সেটাই কি শুভ?

লং লিভ শুভ। নিজের অজান্তেই বিড় বিড় করে উঠলাম আমি।

সিডনী, ৪-৭ ডিসেম্বর, ২০১০